গোধূলি গগনে

মীনাক্ষী সিংহ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

আত্মজ	৯
চাহনি	১৩
যদিও সন্ধ্যা	১৭
পুনশ্চ	২১
ফিরে দেখা ২০০০	২৫
তর্পণ	৩০
নয়নতারা	৩৫
সূর্যমুখী	৩৯
জন্মদিন	৪৩
অধরা মাধুরী	৫০
রবির আলো	৫৪
হৃদয়ে ছিল জেগে	৬২
যে নদী মরুপথে	৬৬
নিরুদ্দেশ যাত্রা	৭১
স্মৃতি চন্দন	৭৭
এ আঁধারে, এ আলোকে	৮৩
লিখন তোমার	৮৯
বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে	৯৩
পুনরাবৃত্ত	৯৯
দিনশেষের রাঙা মুকুল	১০৩
আমার না বলা বাণী	১০৮

॥ আত্মজ ॥

খবরের কাগজে বিশেষ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটি একুশ বছরের তরুণ এসেছে এই কলকাতায়, তার মায়ের খোঁজে। ছেলেটি ভারতীয়, আরো বিশদভাবে বলতে গেলে বাঙালি। ষোলো বছর আগে এক অনাথ আশ্রম থেকে নিঃসন্তান এক আমেরিকান দম্পতি তাকে দত্তক নিয়ে ওদেশে চলে যায়। ছেলেটি ওদেশেই বড় হয়েছে; পড়াশোনা করেছে ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হয়েছে তার জন্মদাত্রী মা'কে সে দেখবে, যাকে স্মৃতি হাতড়ে সে এখনও আবছা দেখতে পায়। কাঁধে ক্যামেরা, গেঞ্জী আর জিন্‌স্ পরা ছেলেটির ছবিও বেরিয়েছে কাগজে। বেশ মায়াবী আকর্ষণ তার বড় বড় চোখে। কিন্তু বাঙালিয়ানার ছাপ কোথাও নেই।

প্রাত্যহিক পাঠকদের বিস্মিত কৌতূহল জাগিয়ে সংবাদপত্রের খবরটি ক্রমে বাসি হ'য়ে গেল।

॥ দুই ॥

কলকাতার উত্তর শহরতলীর একটি অনাথাশ্রম। একটি নামী সংস্থার অনুদানে এখানকার শিশু-কিশোর আবাসিকরা বেড়ে উঠছে। আজ এখানে বিশেষ একটু সাড়া জেগেছে। এক বিদেশী অতিথি আসবেন। অনাথাশ্রমের বালিকাবিভাগের ভারপ্রাপ্তা বড়দি আর ছেলেদের বিভাগের হেডস্যার গত তিনদিন ধরে ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে রেখেছেন।

সকাল দশটা বাজতেই একটা দুধসাদা মারুতি জেন দীপায়নের গেটে এসে দাঁড়ালো। এদের পরিচালন সংস্থার সভাপতির সঙ্গে গাড়ি থেকে নামলো একটি ঝকঝকে তরুণ, কাঁধে ক্যামেরা নীলগেঞ্জী ও সাদা জিনস্ পরণে। তার চালচলনে আমেরিকান প্রভাব সুমুদ্রিত। অনাথ আশ্রমের ফুটফুটে এক শিশু তার গলায় মালা পরিয়ে দিল, কয়েকটি বালিকা হাতে দিল গোলাপের গুচ্ছ; একজন তার কপালে পরালো চন্দনের ফোঁটা—সঙ্গে বাজল মাঙ্গলিক শঙ্খ। তারপর আরো একদল প্রদীপ হাতে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরলো তাকে মাঝখানে রেখে। এই অভিনব আবাহন অনুষ্ঠান মুগ্ধ, বিস্মিত তরুণ হাসিমুখে উপভোগ করছিল। কিশোর আবাসিকরা সমস্বরে বলল—"ওয়েলকাম টু দীপায়ন।'

কৌতুক-কৌতূহল খেলা করে গেল তরুণের চোখে মুখে। দুহাত জড়ো করে সে মার্কিন অ্যাকসেন্টে সদ্য শেখা একটি শব্দ ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ করলো—'ধননোবাদ'। তারপর ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েদের দিকে, হাসিভরা দৃষ্টিতে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ইশারায় তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইল।

অফিসঘরে বসে অনাবাসী ভারতীয় ভদ্রলোক দীপায়নের পরিচালন সংস্থার সভাপতি, তখন বড়দি আর হেডস্যারকে শোনাচ্ছেন এক আশ্চর্য অনুসন্ধানের অভিনব কাহিনি। আর বাইরের বিশাল বাগানে ডেভিড তখন অনাথাশ্রমের বালকবালিকাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখছে চারিপাশের সবাইকে, সবকিছুকে। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। ডেভিড মাঝে মাঝেই ছোট ছেলেদের মধ্যে কাউকে দেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—কী যেন ভাবছে আপনমনে।

ওদিকে অফিসঘরে মি. ব্যানার্জি শুনিয়ে চলেছেন এক আশ্চর্য কাহিনি।

॥ তিন ॥

ষোলো বছর আগে এই দীপায়ন থেকেই ডেভিডকে দত্তক নিয়েছিলেন আমেরিকার জনমার্টিন ও তাঁর স্ত্রী। ডেভিডের আসল নাম তাঁদের মনে নেই। ডেভিড ও দীর্ঘ ষোলো বছর আমেরিকায় কাটিয়ে তাঁর শৈশবের মাতৃভাষা বাংলা ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তার নিজের নাম। সে পড়াশোনা করেছে ওখানকার স্কুলে। রাগবি খেলেছে সিনিয়র স্কুলে—এখন খেলে টেনিস। ওদেশে আছে তার বন্ধুর দল। আছে শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবীও। কিন্তু কিছুদিন ধরেই সে তার ড্যাডি আর মাম্মিকে এক আশ্চর্য কথা বলেছে। তার নাকি প্রায় অস্পষ্ট ছবির মত মনে পড়ে এক মহিলাকে। যিনি তার হাত ধরে কখনো তাকে কোলে নিয়ে কোথায় যেন ঘুরে বেড়াতেন। যে ভাষায় তিনি কথা বলতেন সেটি তার অচেনা। সে ভাষা ডেভিড ভুলে গেছে।

কিছুদিন আগে ওদেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল একটি ইন্ডিয়ান ছবি দেখতে গিয়ে তার মনে পড়েছে ছেঁড়া ছেঁড়া জলছবির মত অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া ভুলে যাওয়া কিছু ঘটনা আর ছবি। তখন থেকেই ডেভিড কেমন যেন উদাসীন, আনমনা। তার একটাই জেদ চাপলো সে ইন্ডিয়াতে যাবে—খুঁজে বার করবে তার আসল মা-কে। মার্টিন দম্পতি—যাঁরা তাঁকে সত্যিই আপন সন্তান বলে ভালোবাসেন—তাঁরাও বিস্মিত। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওদেশেই সাইকিয়াট্রিসের কাছে নিয়ে গেলেন ডেভিডকে। অনেকগুলো সীটিং-এর পর ডেভিড জানালো ওই ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটা দৃশ্য তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছি। দৃশ্যটি—সাজানো এক খাবারের দোকান থেকে একটি ছোট ছেলে খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

এই দৃশ্যটা ডেভিডকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে।

মনোরোগ চিকিৎসকের চেম্বারে নানা থেরাপীর পর ডেভিড জানায়—তার মনে পড়েছে তার ছেলেবেলার কথা। সে আবছা দেখতে পাচ্ছে তার মার সঙ্গে একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে সে থাকত; আর খাবারের সন্ধানে মা তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতো। একটু বড় হয়ে ডেভিড যে তখনো ছোট্ট একরত্তি শিশু, তার মার জন্য খাবার ভিক্ষে করে আনত। কখনো কখনো দোকান থেকে চুরি করার চেষ্টাও করেছে।

আজকের ডেভিড ভুলে গেছে তার দেশের নাম, শহরের কথা, মার নাম এমনকি নিজের ভাষা, নামটাও। কিন্তু এক অন্ধ আবেগে সে আজ দিশাহারা। তার মনে একটাই প্রশ্ন আর একরাশ অভিমান—কেন তার মা তাকে দিয়ে দিল কিংবা বেচেদিল? সে তো ভিখারিনী, দরিদ্র মার হাত ধরেই অনেক ঝড়, জল, রোদ্দুর মাথায় মেখে বেঁচেছিল। বাঁচতে চেয়েছিল। আজকের ডেভিড মার্টিন, ইনফরমেশান টেকনোলজীর তরুণ প্রযুক্তি বিজ্ঞানী, পপ গানের ভক্ত, মার্টিন তরুণীদের প্রিয় যুবক হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে ফিরে পেতে চাইছে তার হারানো অতীতকে। আমেরিকার বর্ণোজ্জ্বল সম্পদ ছেড়ে ফিরে যেতে চাইছে তার হারানো মার কাছে। একটিবার সে জানতে চায়, কেন তার মা তাকে ছেড়ে দিল? সে তো মার কাছে বিত্ত-বৈভব কিছু চায়নি আজ যেন সে স্মৃতি-দূরবীন দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ছোট্ট এক শিশুকে। মলিন শাড়ী পরা শীর্ণ চেহারার মায়ের হাত ধরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতা নামের অনেক দূরের এক শহরের রাস্তায়।

খবরের কাগজে এত কথা লেখা ছিল না। মিঃ ব্যানার্জি জানালেন অনেক চেষ্টায় অনেক খোঁজ খবর করে মার্টিন দম্পতি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন—তাঁদের মাধ্যমে পেয়েছেন কলকাতার উপকণ্ঠের দীপায়ন অনাথাশ্রমের খোঁজ। এখান থেকেই তাঁরা ষোলোবছর আগে ডেভিডকে দত্তক নিয়েছিলেন। এখনকার অধ্যক্ষা বড়দি শ্রীমতী সুলেখা সান্যাল ও হেডস্যার শ্রীসুদেব সান্যাল-স্বামী স্ত্রী মিলে এটির দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে তাঁরা এসেছেন দশবছর আগে। আগের অধ্যক্ষ মিত্রমশাই মারা গেছেন। একবার আগুনে পুড়ে গিয়েছিল পুরোনো অফিস। তাই ষোলোবছর আগের নথিপত্র কিছুই পাওয়া গেল না।

ডেভিড ঘুরে ঘুরে দেখছে। সে-ও এমনিই এক দরিদ্র শিশু ছিল একদিন। এই অনাথাশ্রমে সে কি করে এসেছিল তার মনে পড়ছে না। তার মা কেন তাকে এখানে পাঠিয়েছিল?

এখানে খোঁজ নিয়ে জানল—এই শিশুদের অনেকেরই মা অথবা অথর্ব দরিদ্র বাবা জীবিত আছেন, যাদের সন্তান পালনের ক্ষমতা নেই। সেই দুঃখিনী মা-রা মাঝে মাঝে এসে সন্তানদের দেখে যান।

ডেভিড-আমেরিকান নাগরিক ডেভিড মার্টিন অবাক বিস্ময়ে ঘুরে বেড়ালো দীপায়নের চারপাশে। হারিয়ে যাওয়া মায়ের খোঁজ সে পেল না, কিন্তু তার মন অনেকটাই শান্ত হ'ল, সান্ত্বনা পেল এই ভেবে যে সে এসে দাঁড়িয়েছে তার জন্মভূমিতে—এখানেই কোথাও আছে তার জন্মদায়িনী মা।

দীপায়নের শিশুরা তার দেওয়া দামী বিদেশি চকোলেট খেতে খেতে খুশি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবাক হল—এই সাহেবের দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামছে। তারা শুনতে পেল না এই ছোকরা সাহেব মনে মনে নতুন শেখা একটি বাংলা শব্দ মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে চলেছে—মা, মা।

॥ চার ॥

অবশেষে ডেভিডের ইন্ডিয়ায় থাকার মেয়াদ ফুরোল। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মার্টিন দম্পতি টেলিফোন করে তার খবর নিচ্ছেন ঘনঘন—কবে ফিরবে তাঁদের ছেলে। তাঁদের মন কেমন করছে। ডেভিডের মনও তাঁদের জন্য খারাপ হয়ে আছে। তাঁদের সে বড্ড ভালোবাসে কোনো দিন এত দীর্ঘ সময় তাঁদের ছেড়ে সে থাকেনি। তবু সে ভারতে এসেছে শিকড়ের সন্ধানে কিন্তু তার সে প্রশ্ন যে এখনো অনুত্তর।

যাবার দিন সদর স্ট্রিটের রাস্তায় শেষবারের মত ঘুরে ঘুরে সে ছবি তুলছে তার ক্যামেরায়; দেখছে দোকানপাট, লোকজন মানুষের ভিড়, যানবাহনের ঠেলাঠেলি এমন সময় সে শুনতে পেলে এক শীর্ণ ভিখারিনী মা তার ছোট্ট ছেলেকে ডাকছে 'খোকা, খাবি আয়।'

ডেভিডের সমস্ত সত্তা হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। এই শহর আজ তার অচেনা, এর পথঘাট তার অজানা, এর লোকজন তার অপরিচিত, কিন্তু এই তিনটি আশ্চর্য শব্দ তার মগ্নচৈতন্যে নাড়া দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল তার মা-ও তাকে এমনভাবেই ডাকতো 'খোকা, খাবি আয়'।

এয়ারপোর্টে যাবার পথে ডেভিড যেন শুনতে পেল অনেক দূর থেকে কেউ তাকে ডাকছে—'খোকা খাবি আয়'।

প্লেনে ওঠার আগে মিঃ ব্যানার্জিকে সে বলে গেল—'Now I remember, my name is KHOKA'.

॥ পাঁচ ॥

নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট :

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বাসী ডেভিড মার্টিন তার ফেলে যাওয়া স্বদেশভূমি দেখে ফিরে গেছে তার বাবা-মার কাছে। এই দুঃস্বপ্নের নগরী ছেড়ে সে ফিরে গেছে স্বপ্ননগরী ক্যালিফোর্নিয়ায়।

॥ ছয় ॥

নীল আকাশের বুকচিরে ভাসমান বিমানে বসে ডেভিড তার ডায়েরীতে তখন ইংরেজি হরফে লিখে রাখছে তার ফিরে পাওয়া হারানো নাম—'খোকা'

লিখছে তার মার মমতাভরা ডাক—

'খোকা, খাবি আয়'।

॥ চাহনি ॥

অবশেষে পৌঁছানো গেল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যে ছেলেটি গাড়ি নিয়ে আনতে গিয়েছিল, বলল—'স্যার আমরা এবারে এসে গেছি।'

পরমেশ তাকিয়ে দেখলেন দীর্ঘ তিনঘণ্টার যাত্রাপথের শেষে একটি বাগানঘেরা বাড়ির গেটের ভিতর গাড়িটা ঢুকছে। মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। ভোর ছ'টায় চা খেয়েই গাড়িতে উঠেছিলেন, মাঝে, একবার রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চা খাওয়া হয়েছে। সঙ্গের ছেলেটি, সুজয় অনুরোধ করেছিল গরম সিঙ্গাড়া আর জিলিপি খাবার জন্য, কিন্তু পরমেশ রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত দুটি সন্দেশ খেতেই হয়েছিল।

গাড়ি থামতেই এক সুদর্শন ভদ্রলোক হাত জোড় করে এগিয়ে এলেন—'পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?'

সুজয় বলল—'আগে চা আর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করুন জয়ন্তদা, স্যার সারা রাস্তায় কিছু খেলেন না। সেই ভোর ছ'টা থেকে এই পাক্কা তিনটি ঘণ্টা'।

—'আসুন, আসুন' বলে ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন জয়ন্ত।

—'ইনি ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী—আমাদের কৃষ্টি পরিষদের সভাপতি এখানকার কলেজের অধ্যাপক।'

হাত তুলে নমস্কার করলেন পরমেশ। 'আপনার বাড়িটি বড় চমৎকার; কলকাতার কোলাহল থেকে এসে ভারী ভালো লাগছে।

অধ্যাপক ভেতরে গেলেন। ঘরের চারদিকে তাকিয়েও মুগ্ধ হলেন পরমেশ। সুরুচির ছাপ সর্বত্র। পরপর তিনটি বই-এর আলমারি। নিজের প্রায় সবগুলি বইকেই সেখানে সাজানো দেখতে পেলেন। একপাশে ছোট টেবিল, অন্যপাশে নীচু সোফাসেট—তারই একটিতে বসেছেন পরমেশ; সামনের শ্বেত পাথরের টেবিলে একটি ঝকঝকে পেতলের ঘটিতে রাখা একটি মস্ত স্থলপদ্ম।

ভেতর থেকে চা ও প্রচুর খাবার নিয়ে একটি কিশোরী ঢুকল। পরমেশকে নীচু হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। জয়ন্তবাবু বললেন—'আমার বোন তিথি; আপনার মস্ত ভক্ত। সব বই পড়ে ফেলেছে।'

খ্যাতিমান লেখক পরমেশ আজো নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হলেন। এই পঁয়তাল্লিশেই পরমেশ বসু রায় খ্যাতির শীর্ষে। সারা বছর লেখালেখি ছাড়াও একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়; সাহিত্য সম্মেলন, বইমেলা, কবিপক্ষ—নানা কাজে তিনি এখন